# নক্ষত্র ও তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিবেদিতা

পূর্বা সেনগুপ্ত

ভগিনী নিবেদিতা এক অসাধারণ মনস্বিনী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আকাশ ও নক্ষত্রকে নিয়ে আলোচনা ও মানবের জীবনে তাদের প্রভাবকে কেন্দ্র করে বিশেষ চর্চা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। যোগেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ পণ্ডিত জ্যোতিষচর্চার সঙ্গে, গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন আচার ও উৎসবের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের অনেক আগেই এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বের পুরাণ, ইতিহাস ও উৎসবের ক্ষেত্রে নক্ষত্র কীভাবে জড়িত এবং ভারতীয় ঋষিরা কীভাবে নক্ষত্রের মহিমা খ্যাপন করেছেন তার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ আমরা নিবেদিতার 'Star-Pictures' প্রবন্ধে দেখতে পাই। এই চমকপ্রদ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'The Modern Review' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে, ১৯১১ ও ১৯১২ সালে। পরবর্তী কালে আনন্দ কুমারস্বামীর গ্রন্থ 'Myths of the Hindus and Buddhists'-এ প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়। বহু পরে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকীর সময় তাঁর রচনাবলির তৃতীয় খণ্ডে এটি অন্তর্ভুক্ত হলে, সম্পাদকীয় নিবেদনে প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণামাতাজী প্রবন্ধটি সম্বন্ধে একটি অসাধারণ রেখাচিত্র অঙ্কন করে বলেছেন :

"It includes myths embedded in the Puranas. Nivedita held the view that the Indian mind interested in astronomy spiritualized most of the mythological characters and they became the heroes of the sky. Here she selects those stories that represent the spiritualising interpretation of the stars."

নিবেদিতা কোন আঙ্গিকে নক্ষত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে বিস্তৃতভাবে তা আলোচনার চেষ্টা করব।

আমরা অধিকাংশ মানুষই শৈশবের স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষণটি কাটিয়েছি সৃষ্টির নানা প্রশ্ন নিয়ে। কোথা থেকে এলাম আমি, এই আমিই বা কে—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সঙ্গে মিশেছে মাথার উপরের আকাশ দেখে আমাদের বিস্ময়! এত গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে বিরাজমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! কী তার উৎস, কোথায় তার শেষ! ধীরে ধীরে বিজ্ঞান আমাদের পরিচিত

করেছে নানা বিষয়ের সঙ্গে। আমরা যুক্তি দিয়ে নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে অভ্যস্ত হয়েছি। ঠিক তেমনই আমাদের মানবসভ্যতার শৈশবক্ষণটিও আকাশভরা সূর্যতারার মধ্যে রহস্য খুঁজে পেয়েছে। মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠার পথে আকাশ, তার গ্রহনক্ষত্রের চলনও অনেকাংশে সাহায্য করেছে। আদিম মানুষের ধারণা ছিল, তাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা আকাশের তারা হয়ে ঝিকমিক করছে। প্রাচীনকালে বিশেষত উষ্ণভাবাপন্ন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের কাছে দিন ছিল সংগ্রামের; আর রাত নিয়ে আসত প্রকৃতির শান্তভাব, যা মানবমনকে চিন্তা করার সুযোগ দিত। সূর্যাস্তের পরেই আকাশের বৃহৎ পুস্তকটি খুলে যেত, কারণ আদিমযুগে আর কোনও গ্রন্থের অস্তিত্বই ছিল না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সভ্যতার আদিক্ষণের সূচনা হয়েছিল জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা সত্যিই নক্ষত্রচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল কারণ তখন মানুষের মন 'তারিখ' (date) সৃষ্টিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। এ আমাদের কষ্টকল্পিত হতে পারে কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার মতে সভ্যতার আদিকালটি বিবর্তিত হয়েছিল প্রায় চারটি স্তরে। প্রথম স্তরে, মানুষের সমস্যা ছিল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ সৃষ্টির জন্য একটি ভাষা সৃষ্টি করা। তারপরই এল দ্বিতীয় স্তর—নিজেদের মনের ভাব একে অপরের কাছে বুঝে নেওয়ার পরে মানুষ আত্মরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করল। এইসময় সৃষ্টি হল নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র। পাথরকে তারা ছুঁচলো করে কোনওরকমে একটি অস্ত্র তৈরি করতে শিখল। অস্ত্র ব্যবহারের অনেক পরে মানুষ আগুনের ব্যবহার জানল, সেটি মানবসমাজের তৃতীয় স্তরে উত্তরণ। আর চতুর্থ স্তরে এল অসীম কালকে বছর ও তারিখে ভাগ করে ফেলার প্রয়াস।

সময় আমরা গণনা করি সূর্যের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির মাধ্যমে, কিন্তু তিথি নির্ণয় করি চন্দ্রের মাধ্যমে। প্রাচীনকাল থেকে সূর্যকে প্রাধান্য দিয়েছিল গ্রিসের সংস্কৃতি, আর চন্দ্রকে ভারতের সংস্কৃতি। নিবেদিতা মনে করেছেন নিশ্চয়ই নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ সূর্য ও চন্দ্রের পর্যবেক্ষণের আগেই বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় ছিল।

রাতের আকাশে এক বীরকে দেখা যায়, যিনি আকাশকে অতিক্রম করছেন, যাঁর পিছনে একটি কুকুর। ভারত সেই নক্ষত্রের সার্থক নামকরণ করেছে—'কালপুরুষ'। কাল অর্থাৎ সময়কে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এতে এক বিচিত্র কার্যকারণ সম্পর্ককে চিহ্নিত করা যায়। ভগিনী তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে কয়েকটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। প্রথমত তিনি নক্ষত্রবিদ্যার সঙ্গে জ্যোতিষবিদ্যার যোগসূত্রকেও তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে নানা পৌরাণিক কাহিনি মূলত নক্ষত্রদের গতিবিধির রূপকচিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। কেবল তাই নয়, আমাদের নানা উৎসবও নক্ষত্রের গতি ও চলনের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। পুরাণ, জ্যোতিষ, উৎসব—সবকিছুই প্রাচীন মানবজাতির নক্ষত্রবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাই নিবেদিতার মতে চন্দ্র ও সূর্যকে পর্যবেক্ষণের আগেই মানুষ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে শিখেছিল। (Thus early science was bound up with religion, and the stars were watched before the moon or the sun was even dimly understood.) প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে প্রাচীন বিজ্ঞানের বহু কাহিনিই ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অথচ সহজ বর্ণনা। যেমন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুবাহন গরুড়ের মতো এক পক্ষীর কথা গ্রিক পুরাণেও আমরা পাই। তাকে বলা হয় 'অ্যাকইলা'। সে-পক্ষীর ডানা হল মেঘ, গতি হল বাতাস, এবং সে সর্বদাই সূর্যতারকাকে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। নক্ষত্র ও তার থেকে সৃষ্ট পৌরাণিক কাহিনিগুলি বর্ণনায় নিবেদিতা ভারতীয়

পুরাণের মতো গ্রিক পুরাণের কাহিনিও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে একটি তুলনামূলক পৌরাণিক সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধে তিনি নক্ষত্রদের গতিবিধির চালচিত্র আঁকতে গিয়ে অসাধারণভাবে মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারাপথ ও তার কিছু পদচিহ্নকে নির্দেশ করেছেন।

ভগিনী কালপুরুষের সঙ্গে সপ্তর্ষিমণ্ডলের (Great Bear) কথাও উল্লেখ করেছেন। কারও কাছে এই সপ্তর্ষিমণ্ডল হল দেবতাদের শয্যা, আবার কারও কাছে রথের বল্গা। তাঁর মতে মধ্য প্রাচ্যের বীর চরিত্র হেরাক্লিসের অনেক কাহিনিই নক্ষত্রদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যের রূপক উপস্থাপনা। এ-প্রসঙ্গে তিনি যে গ্রিক পুরাণের নারীচরিত্র অ্যালসেস্টিসের উল্লেখ করেছেন তা চিত্তাকর্ষক। ভগিনী ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি আলোচনায় মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত অসাধারণ নারীচরিত্র সাবিত্রীর সঙ্গে অ্যালসেস্টিসের সাদৃশ্যকে উল্লেখ করেছেন। সাবিত্রী মৃত স্বামী সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু গ্রিক পুরাণে বিপরীত ঘটনাই দেখা যায়। অ্যালসেস্টিস তাঁর স্বামীর মৃত্যু নিজ জীবনে ধারণ করেছিলেন এবং মৃত অ্যালসেস্টিসকে জীবনদান করেছিলেন হারকিউলিস। নক্ষত্রবিষয়ে এই কাহিনি উল্লেখযোগ্য হয়েছে কারণ নিবেদিতা এই দুই কাহিনির মধ্যে সূর্যের ভূমিকাকে নির্দেশ করেছেন। সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর কাছে বরপ্রাপ্ত ছিলেন অ্যালসেস্টিসের স্বামী অ্যাডমেটাস। আর সাবিত্রী তো সবিতা বা সূর্যেরই কন্যা বা সূর্যজাতা। ভগিনী বলছেন, ''অ্যাডমেটাসের কাছে অ্যালসেস্টিসের ফিরে আসার ঘটনা কি নক্ষত্রমধ্যে সূর্যকে প্রতিষ্ঠা করার ঘটনার ইঙ্গিত দেয় না? কিংবা অ্যানড্রোমিডা বা ক্যাসিওপিয়ার মধ্যে যে-রেখাচিত্রের দৃশ্য তাতে পার্সিয়ুস কি চিরকালই বীর ছিলেন না? (Whether Alcestis restored to the house of Admetus is not, in truth, the sun brought back to its place amongst the stars, or whether Perseus was not always a hero seen in outline between Andromeda and Cassiopeia– these questions, and others like them, will never, probably, be fully answered. A little we may be able to spell out from the very fringe of the great subject, but the whole story of psychological origin of mythology we cannot possibly decipher.)

অ্যানড্রোমিডা, ক্যাসিওপিয়া ও পার্সিয়ুস—

তিনজনেই গ্রিক পুরাণের চরিত্র। বিশ্বাস, এই তিনজনই আকাশে নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁরা নাবিকদের পথ নির্ণয়ে সাহায্য করেন। তবে এইসব তথ্য নিয়ে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেও নিবেদিতা জানাচ্ছেন, পুরাণ ও নক্ষত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা অসম্ভব। কারণ পৌরাণিক সাহিত্য সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক কারণ (psychological origin of mythology) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথম দিকে তা ছিল শিশুদের সিন্ডেরেলার কাহিনির মতোই। কিছু নক্ষত্রের গতিবিধি সমস্ত জাতির মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেকেই নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার বর্ণনা করেছে। ভগিনী এর মধ্যে অগস্ত্য ও অজ-একপাদের কাহিনির উল্লেখ করেছেন।

পুরাণে উল্লিখিত ঋষি অগস্ত্যের কাহিনি আমরা সকলেই জানি। ঋষি পুলস্ত্যের পুত্র অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন। উত্তরের সুবিশাল হিমালয় পর্বত ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। বিন্ধ্যপর্বত চেষ্টা করে যে নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করে হিমালয়ের মতো উচ্চতায় পৌঁছবে। কিন্তু এতে রাজনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়াবে বিন্ধ্য। তাই ঋষি অগস্ত্য তাঁর শিষ্যকে সঠিক পথে আনতে এক কৌশলের সাহায্য নিলেন। তিনি বিন্ধ্য পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন এবং শিষ্যের অবনত মস্তকে পা রেখে আদেশ দিলেন—যতদিন আমি এই পথে প্রত্যাবর্তন না করি ততদিন তুমি মাথা তুলো না। এরপর অগস্ত্য আর কোনওদিনই সেই পথে ফিরে এলেন না। ফলে বিন্ধ্যের মাথা চিরকালই অবনত রইল।

এখানে দুটি বিষয় নক্ষত্রচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অগস্ত্য যে-দিনটিতে যাত্রা করেছিলেন সেই দিনটি ছিল পয়লা বা ১ তারিখ। এখনও মনে করা হয় যে মাসের ১ তারিখে যাত্রা করলে আর ফেরা না-ও হতে পারে, যেমন ঋষি অগস্ত্য ফিরে আসেননি। তাই ১ তারিখের যাত্রাকে অগস্ত্যযাত্রা বলে চিহ্নিত করা হয়। এর সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্রের অবস্থান। এই নক্ষত্র মাসের প্রথমে উত্তর আকাশে প্রতিভাত হয়ে দক্ষিণে গিয়ে বিলীন হয়। এই যাত্রাপথ থেকেই কি মাসগণনার সৃষ্টি? কারণ দক্ষিণ ভারতে অগস্ত্যযাত্রার পথ অনুসারে পৃথক পঞ্জিকা তৈরি হয়েছে; চোল, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ এই পঞ্জিকা অনুযায়ী দিনযাপন করেন। নিবেদিতা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেছেন, ঋষি অগস্ত্য দক্ষিণ ভারতে জনপ্রিয় ও অনুসরণীয় ঋষি; হিমালয়েও 'অগস্ত্যমুনি' নামে একটি গ্রামের দেখা পাওয়া যায়; তাহলে কি এই গ্রামের সঙ্গেও ঋষি অগস্ত্য বা নক্ষত্র অগস্ত্যের কিছু সংযোগ আছে?

এরপর নিবেদিতা জানিয়েছেন, অগস্ত্যই একমাত্র 'নক্ষত্ররূপী পূর্বপুরুষ' নন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতজন নক্ষত্রকেও আমরা ঋষি বা পূর্বপুরুষ বলে চিহ্নিত করি। নিবেদিতার মতে 'নক্ষত্রের ব্যক্তিরূপ' সহজেই পূর্বপুরুষপূজায় পর্যবসিত হয়েছে। এখনও আমরা মনে করি আমাদের প্রিয়জন মৃত্যুর পর আকাশের তারা হয়ে যান। এ-প্রসঙ্গে নিবেদিতা অরুন্ধতী নক্ষত্র ও ডগস্টার সিরিয়াসের কথা বলেছেন।

এইসমস্ত আলোচনার পর নিবেদিতা সব থেকে উজ্জ্বল তারা ধ্রুবতারার প্রসঙ্গ এনেছেন। পুরুষ রূপ-ধারী প্রাচীনতম দেবতা সম্ভবত ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা সম্পর্কে নিবেদিতা বলেছেন, ''নক্ষত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যেসব কাহিনিতে রয়েছে তার মধ্যে রত্নস্বরূপ হল ধ্রুবের কাহিনি। ধ্রুবতারা কীভাবে এমন স্থির হল, এ তারই বিবরণ।''

বৈদিক যুগেও যে নক্ষত্রচর্চাকে রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হত সেকথা বলেছেন নিবেদিতা। তাঁর

মতে ঋগ্‌বেদে 'অজ-একপাদ' বা একপদ বিশিষ্ট ছাগের অজস্র উল্লেখ আছে। নিবেদিতা প্রথমে বলেছেন, মনে হয় নক্ষত্রজগতের শীর্ষে ধ্রুবতারার একক অবস্থান থেকে এক-পা-ওলা দেবতার কল্পনা জন্ম নিয়েছে। একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান বলে একপদ—এই কল্পনাকে ভগিনী আরও তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি আলোচনায় দেখিয়েছেন কেবল ভারতে নয়, অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশের সমাজে, পুরাণে, লোককথায় এই একপদ দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিবেদিতা বলেছেন, ''আমরা যখন জানতে পারি যে অস্ট্রেলিয়ার বন্য আদিবাসীদের মধ্যে 'টুরানবুলান' নামে এক নক্ষত্র দেবতা আছেন, যিনি প্লাইয়াডদের প্রভু ও রক্ষক, তাঁর একটি চোখ ও একটি পা, তখন বুঝতে পারি যে এ-কল্পনা কত প্রাচীন। এরপরে ওডিন বা একচক্ষু সাইক্লপ অথবা স্বর্গের কর্মকার হেফাইসটস—যাঁর এক পা পঙ্গু—আমাদের মনে আর বিস্ময় জাগায় না। এই পঙ্গু দেবতা থেকেই স্পষ্টত উদ্ভব হয়েছে মহাদেবতা প্যানের—যাঁর একটি পা অনেকটা ছাগলের মতো। এই গভীর, কমনীয় এশীয় কল্পনা হেলেনীয় ভাবধারায় প্রবেশ করেছে প্রাচীন ফ্রিজিয়া থেকে। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও প্রায়ই শোনা যায় যে ধ্রুবতারার দেবতাকে একসময় ছাগলরূপী বলে মনে করা হত।'' এখানে ভগিনী পৌরাণিক সাহিত্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিবেদিতার মনে হয়েছে, ঋগ্‌বেদে যখন বলা হচ্ছে 'যার এক পা আছে সে দ্বিপদকে ছাড়িয়ে গেছে', তখন মনে হয় ধ্রুবতারা নয়—এখানে সূর্যকেই একপদরূপে কল্পনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে আধুনিক মানুষের মনে সূর্যই একপদরূপে প্রতিভাত হন।

নক্ষত্রকে এই একপদ ছাগরূপী ভাবনার সঙ্গে নিবেদিতা সংযুক্ত করেছেন পুরাণের শিব ও দক্ষের কাহিনিটি। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করার জন্য মানসপুত্রদের সৃষ্টি করছেন। তারপর তাঁরা বৈরাগ্যবশত সৃষ্টিকার্যে অংশগ্রহণ না করায় প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেছেন। এই প্রজাপতিদের মধ্যে প্রধান দক্ষ। তাঁর সঙ্গে শিবের দ্বন্দ্বে সতী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শিব বীরভদ্রের মাধ্যমে দক্ষকে শাস্তি দিলে দক্ষ নিজ মুণ্ড হারিয়ে ছাগমুণ্ডধারী হয়েছেন। এখানে নক্ষত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় ভগিনী নির্দেশ করেছেন : দক্ষের ছাগমুণ্ড, সতীর সঙ্গে বিবাহের সময় সতীর প্রতি শিবের উক্তি—'ওই ধ্রুবতারাকে দেখো', এবং সতীর দেহত্যাগের পর তাঁর দেহ বাহান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হওয়া। এই বাহান্ন সংখ্যাটি কি বছরে কয়টি সপ্তাহ তারই ইঙ্গিত বহন করে?

এরই সঙ্গে নিবেদিতা জানিয়েছেন, এই ধরনের কাহিনি আমরা গ্রিক পুরাণে পেয়ে থাকি। সেটি মহাদেবী ডিমিটরের কাহিনি। অথবা এ হল সেই ওসিরিসের দেহ যা আইসিস খুঁজে বার করেছিল বিবলসের সাইপ্রেস গাছের মধ্যে। ওসিরিসের দেহের খণ্ড ছিল বাহাত্তরটি। এইভাবে সমগ্র বছরকে সবথেকে বেশি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। নিবেদিতা বলেছেন, ''আধুনিক কাহিনিতে আমরা দেখি, বছরের মোট সপ্তাহগুলি সূচিত করে এক-একটি সংখ্যা। সতীর দেহ খণ্ডিত হয়েছিল বাহান্ন খণ্ডে। তাহলে কি বুঝতে হবে যে সতী হল আমাদের বর্তমান গণনার ঐতিহাসিক প্রাচীন কোনও ব্যক্তিরূপ?'' (In the more modern story we find ourselves dealing again with a number characteristic of the weeks of the year. The fragments of the body of Sati are fifty-two. Does she, then, represent some ancient personification which may have been the historic root of our present reckoning?)

প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রচিত্র বর্ণনার সঙ্গে পুরাণ ও

পৌরাণিক কাহিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নিবেদিতা পুরাণ সম্বন্ধে বলেছেন, '' 'পুরাণ' নামক সাহিত্যসমষ্টিতে এমন শত শত কাহিনি রয়েছে যা বর্তমান হিন্দুদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ছাড়া কারওরই জানা নেই। অথচ এর প্রত্যেকটি কাহিনিই নিশ্চয় প্রথমে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ভাল করে দেখলে হয়তো কোনও ঐতিহাসিক রহস্যেরই খোঁজ পাওয়া যাবে।''

নিবেদিতা নক্ষত্রচর্চা প্রসঙ্গে দক্ষের কাহিনির উল্লেখ করেছেন। পুরাণমতে প্রজাপতি দক্ষের আঠাশটি কন্যা। কোনও পুরাণে সতী কনিষ্ঠা, কোনও পুরাণে তিনি জ্যেষ্ঠা। কিন্তু জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা যাই হোন না কেন, দক্ষের অপর সাতাশ জন কন্যার থেকে সতী যে পৃথক তা স্পষ্ট। দক্ষ অপর সাতাশ জনের বিবাহ দিয়েছিলেন চন্দ্রের সঙ্গে, কিন্তু চন্দ্র এঁদের মধ্যে রোহিণীকে সর্বাধিক স্নেহ করতেন। এই সাতাশ জন কন্যার মধ্যে কেউ উগ্র, কেউ বা শান্ত। দক্ষকন্যাগণ নক্ষত্ররূপে চন্দ্রের চিরসঙ্গী। প্রতিদিন সাতাশটির মধ্যে কোনও না কোনও নক্ষত্র চন্দ্রের সঙ্গে বিরাজ করেন। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে এঁদের গুরুত্ব অনেক। ভগিনী এই নক্ষত্রগুলির উল্লেখ করেননি। কিন্তু প্রজাপতি দক্ষের কাহিনির সঙ্গে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ও সময় নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্বন্ধ রয়েছে।

আমরা নক্ষত্রের মাধ্যমে মাস ও সপ্তাহ গণনার উৎস দেখলাম। এরপরে নিবেদিতা প্রতিটি দিনের সঙ্গে নক্ষত্রচর্চার সংযোগ দেখিয়েছেন। সপ্তাহ সাত দিনে, এই সাত সংখ্যাটি হয়তো এসেছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি নক্ষত্র থেকে। প্রতিটি দিনকে আমরা এক একটি গ্রহের নামে চিহ্নিত করি। প্রথমে শনিবার থেকে সপ্তাহ গণনা হত। ভগিনীর মতে এই জন্যই শনিপূজার এত মাহাত্ম্য। শনি সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনিটির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন নিবেদিতা এবং বলেছেন, শনিপূজা ততটাই প্রাচীন যতটা গণেশের হস্তিমুণ্ড হওয়ার ঘটনা। গণেশের এই দেহকেও নিবেদিতা 'মেঘের আড়ালে অস্তমিত সূর্যের মতো' বলে বর্ণনা করেছেন। শনিপূজার প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, গ্রহপূজা কি ক্যালডিয়া (Chaldea) থেকে ভারতে এসেছিল? হয়তো বিদেশ থেকে আগত বলে শনি সম্পর্কে ভীতির ধারণা গড়ে উঠেছে। নিবেদিতা আবার শুক্র গ্রহের প্রসঙ্গে কচ ও দেবযানীর কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি বৃহস্পতির সঙ্গে শুক্রের বিরোধিতা এবং অসুর সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে দেবযানীর কাহিনি যখন রচিত হয়েছিল তখন সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অসুর হল সেই জাতি যারা জাদুবিদ্যায় পটু ছিল। এই ধারণা কি অ্যাসিরিয়া থেকে ভারতে এসেছিল? কারণ অ্যাসিরিয়া গড়ে উঠেছিল 'অসুর' নগরকে কেন্দ্র করে এবং তারা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। শনির মতো শুক্র বা ভেনাসের ধারণাও বহিরাগত। এইসব কাহিনির মধ্য দিয়ে গ্রহপূজাকে কাব্যিক রূপ দান করা হয়েছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি নক্ষত্রচিত্র আলোচনার সঙ্গে নিবেদিতা মানবসমাজে তত্ত্বের বিবর্তনের ধারার একটি রূপরেখা দিয়েছেন। ধর্মের উৎপত্তিজনিত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব, আদিম মানুষের মনে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম ও তার বৈচিত্র্যই প্রথম ধর্মভাবের সৃষ্টি করেছিল। মানুষ যত সঙ্ঘবদ্ধ হতে শিখল, কৃষিকাজ জানল, ততই ধর্মভাবনা উন্নত ও পরিশীলিত হতে থাকল। তারা তখন পূর্বপুরুষকে অর্চনা করতে শিখল। কিন্তু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ রইল। কারণ মানুষ তখনও সম্পূর্ণত প্রকৃতির অধীন। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছিলেন বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বায়ু ও জলের দেবতা বরুণ, অগ্নির দেবতা অগ্নিদেব। এই প্রকৃতিপূজার একটি অংশ নক্ষত্রচিত্রের মধ্যে আমরা পাই। কিন্তু নক্ষত্র নিয়ে

গভীর মননশীলতা নিবেদিতার মতে সভ্যতা বিকাশের চতুর্থ পর্যায়ে শুরু হয়েছে, যখন মানুষ অনন্ত কালকে সীমায়িত করতে আগ্রহী হয়েছে। দিন আর রাত্রির পরিক্রমণকে সপ্তাহ, মাস ও বছরে সে বিভক্ত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে ঋতুর। ধীরে ধীরে সমাজের অগ্রগতি হয়েছে। সময়গণনার জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। নক্ষত্রের চলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ধর্মীয় উৎসব। একসময় নক্ষত্র, গ্রহ ও প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বস্তুগত লাভের ইচ্ছা ভারতের ধর্মভাবনাকে আচ্ছাদিত করেছিল। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড ছিল অবহেলিত। ভগিনী নিবেদিতার মতে এই সময়ই তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব। ভগিনী জানিয়েছেন, তার আগে ''হিন্দুধর্মে এমন একটি সময় এসেছিল যখন ধর্ম সব শক্তিশালী ও পার্থিব কল্যাণকারী দেবতাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এক্ষেত্রে দাবি ছিল, দেবতাদেরকেও ভক্তের মতোই ধন ও বস্তুবাদী লাভকে ত্যাগ করতে হবে।'' (A time came in Hinduism when religion turned its back on all the deities of power and worldly good. The god, like his worshipper, must eschew wealth and material benefits.) সেটি ছিল খ্রিস্টজন্মের পাঁচশত বছর পূর্ব। তথাগত জনগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্যরূপে ত্যাগ ও ব্যক্তিগত উন্নতির কথা বললেন। খ্রিস্টধর্মের উদ্ভবের কালে, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের পাঁচশত বছর পর, ব্যক্তিগত ত্যাগ-তিতিক্ষার ধর্ম এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ভগিনীর মতে এরও পরে শিবপূজার উদ্ভব। বৈদিক রুদ্র তখন শিবরূপে প্রকাশিত। ব্রহ্মার গুরুত্ব সংকুচিত হয়ে শিবরূপের উৎপত্তি বলে ভগিনী মনে করেছেন এবং ভিন্ন এক আলোচনায় বৌদ্ধ স্তূপ থেকে ধীরে ধীরে শিবলিঙ্গপূজার উৎপত্তি দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ- পরবর্তী যুগে শিবের উৎপত্তি সংযোজনেও হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের ধারা থেমে রইল না। এরপর কৃষ্ণের মূর্তিতে সৃষ্টি হল সত্যনারায়ণের পূজা। কেদারনাথ ভ্রমণে ভগিনী এই পূজার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই পূজার পরিণত ফলরূপে ভারতের জাতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত' রচিত হল।

ভগিনী নিবেদিতা মহাভারত সম্বন্ধে বলেছেন, ''অনেক পণ্ডিতের মতে, মহাভারতে প্রাচীন আকাশ-পর্যবেক্ষকদের আদিম বিস্ময়ের জগতকে আমরা নতুন করে পাই। এর পাতায় পাতায় দেবতা, বীর আর উপদেবতার ছড়াছড়ি। এখানে-ওখানে দু-একটা নাম বা অন্য কোনও ইঙ্গিতের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে তারা কোথা থেকে এসেছে বা তাদের পূর্ব-ইতিহাস কী ছিল।'' অসাধারণ ভাষায় তিনি আরও বলেছেন, ''As in some marvellous tapestry, they are here gathered together, in one case for a battle, in another for a life; and out of the clash of the foemen's steel, out of the loyalty of vassal and comrade, out of warring loves and conflicting ideals, is made one of the noblest of the scriptures of the world. Is it true that, with the exception of what has been added and remoulded by a supreme poet, fusing into a single molten mass the images of aeons past, most of the characters that move with such ease across these inspiring pages have stepped down from the stage of the midnight sky?''—''অপূর্ব সূচিকার্যের নকশার মতো, এখানে সবাই মিলিত হয়েছে কখনও যুদ্ধের জন্য, কখনও বা জীবনের জন্য। শত্রুর অস্ত্রের ঝনঝনায়, প্রজা ও বন্ধুদের আনুগত্যে, বিবদমান প্রেম ও আদর্শের সংঘাতে গড়ে উঠেছে জগতের মহত্তম একটি শাস্ত্র। একথা

কি সত্য, অতীত যুগে অগণ্য চরিত্রকে একটি একক স্থানে মিলিত করে একজন শ্রেষ্ঠ কবি যা যোগ করেছেন ও নতুন করে গড়েছেন, তাকে বাদ দিলে এই প্রেরণাদায়ী গ্রন্থটির পাতায় যেসব চরিত্র অতি সহজে ঘোরাফেরা করে, তার অধিকাংশই মাঝরাতের আকাশ থেকে নেমে এসেছে?"

ভগিনী উক্ত প্রবন্ধে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁর পঞ্চভ্রাতা সশরীরে স্বর্গগমনে তৎপর। কারণ এর ফলে তাঁরা নক্ষত্রলোকে স্থানলাভ করবেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর কেউই স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে পারলেন না। পথে একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল। যুধিষ্ঠির তাকে নিয়ে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গে আহ্বান করলেও তিনি গেলেন না কারণ তাঁর চার ভাই ও পত্নী দ্রৌপদী যে একই উদ্দেশ্যে নির্গত হয়েছিলেন, তাঁদের কী হল? দেবরাজ ইন্দ্র জানালেন তাঁরা আগেই স্বর্গে গিয়েছেন। তাহলে যাওয়া যেতে পারে! কিন্তু কুকুর সহ কী করে স্বর্গে প্রবেশ সম্ভব? এখানে যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধ অসাধারণ। শরণাগতকে ত্যাগ কী করে করবেন তিনি? অবশেষে পরীক্ষার শেষ হল। ধর্মবোধে উজ্জ্বল যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ করলেন। কিন্তু স্বর্গে তিনি শত্রু দুর্যোধনকে আনন্দে অবস্থান করতে দেখলেন আর তাঁর প্রিয়জনদের দেখলেন দুঃখে, দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ নরকে। যুধিষ্ঠির স্বর্গ ফেলে তাঁদের সঙ্গে নরকেই বাস করবেন বলে জানালে সমস্ত পরীক্ষার শেষ হল। সমস্ত দুঃস্বপ্ন শেষ হলে দেবগণ বললেন, ''এখন আপনি স্বর্গগঙ্গায় স্নান করুন। সেখানে স্নান করলে সমস্ত শত্রুতা ও দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আপনিই একমাত্র মানুষ যিনি সশরীরে স্বর্গে এসেছেন।"

উল্লেখ্য, স্বর্গগঙ্গা হল অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে গঠিত ছায়াপথ। সুতরাং এখানেও নক্ষত্রচিত্র এসেছে কিন্তু পার্থক্য এই, নক্ষত্র ও মহাকাশের সঙ্গে মানবের চারিত্রিক উন্নতি, নীতিবোধের প্রকৃষ্ট উত্তরণের ছবিও চিত্রিত হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার মতে, দক্ষ ও শিবের ঘটনায় যার সূত্রপাত, যুধিষ্ঠিরের ঘটনায় তারই পরিণত রূপ দেখতে পাই। শিবের উৎপত্তি থেকে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মাহাত্ম্যকে তিনি একটি আত্মিক উন্নতির বিবর্তনের ধারারূপে চিহ্নিত করেছেন। ভগিনী বলেছেন, ''দক্ষ ও শিবের গল্পে যে-আধ্যাত্মিকতার সূত্রপাত দেখেছিলাম, এখানে দেখতে পাচ্ছি তার পরিণত রূপ। মহাজাগতিক প্রভাব ও শক্তির প্রাচীন পূজা থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে আকাশের নায়ক এখন আর প্রজাপতি বা সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি বন্য শিকারী হয়ে শীতের সূর্যকে হত্যাও করছেন না, বরং এখন আমাদের মতোই সম্পূর্ণ মানুষ, শুধু কিছুটা মহত্তর—এই যা। হিন্দুর কল্পনা এখন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে মানুষের আত্মজয়ের চেয়ে বড় কিছু সে ভাবতেই পারে না। যুধিষ্ঠির মানুষের মধ্যে রাজকীয়তা, পুরুষোচিত বিশ্বস্ততা ও সততায় দীপ্ত—মনুষ্য-নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল।"

এই 'নক্ষত্রচিত্র' প্রবন্ধে নিবেদিতা অসাধারণ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পৌরাণিক সাহিত্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর চিত্রণকে একত্রে মিলিয়েছেন, আবার একইসঙ্গে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক পৌরাণিক ক্ষেত্রটিকেও প্রকাশ করেছেন। এইসঙ্গে নক্ষত্রদের রহস্যময় জগতটিও পরিস্ফুট হয়েছে সার্থকভাবে। ভারতের পুরাণ, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাসে ভগিনী নিবেদিতার এই রচনাটি একটি নবতম সংযোজন।